উত্তরবঙ্গে যোগাযোগ

দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ দিশারী সংকল্প (বেলতলা পার্ক), বালুরঘাট, তুহিনশুভ্র মন্ডল, ৯৭৩৩২২৮৯৬৬, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব, রাজা রাউত, ৯৪৭৪৪১৭১৭৮, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম, ৯৪৩৪২১২০৮২, ৯৫৬৩৪১০২১৭

বিজ্ঞান অন্বেষক

জলাভূমি প্রকৃতির কিডনি, একে বাঁচান; জলাশয় ভরাটের প্রতিবাদ করুন।

বর্ষ -৭ সংখ্যা - ৪ জুলাই-আগস্ট /২০১০ RNI No. WBBEN/03/11192 দাম ১টাকা

তাঁত বস্ত্রে ভেষজ রঙের প্রয়োজনীয়তা

অতি প্রাচীন কাল থেকে ভেষজ রঙ এর ব্যবহার হয়ে আসছে। গ্রীস, রোম, মিশর এবং ভারতবর্ষ সমেত পৃথিবীর অনেক প্রাচীন সভ্যদেশে ভেষজ রঙ নিষ্কাশন ও বস্ত্র রঞ্জনে তার প্রয়োগ পদ্ধতি সুন্দর ছিল।

এর উপকরণ হিসাবে বিভিন্ন গাছ-গাছড়ার ছাল, পাতা, ফুল, ফল, বীজ, শিকড়, নানাবিধ জৈব বর্জ্য এবং প্রাকৃতিক খনিজ পদার্থের ব্যবহার করা হয়। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভেষজ রঙ-ই বস্ত্র রঙের প্রধান উপকরণ। এরপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে রাসায়নিক রঙ এর আবির্ভাব ঘটে এবং বস্ত্রশিল্পে এর ব্যবহার সার্বজনীন রূপ গ্রহণ করে। ফলে ভারতবর্ষের সীমিত কিছু অঞ্চলেই ভেষজ রঙ ব্যবহার সীমাবদ্ধ থাকে।

এরপর 4 পাতায়

বাসব প্রেমানন্দ

একটি যুক্তিবাদী জীবন

ভারতের যুক্তিবাদী আদোলনের পুরোধাপুরুষ বাসব প্রেমানন্দ আর নেই। গত ৪ঠা অক্টোবর ২০০৯ তামিলনাড়ুর পোদানুরে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। ভারতের যুক্তিবাদী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা তাঁর হাত ধরেই। প্রায় চল্লিশ বছর তিনি ভারতবর্ষের পথে প্রান্তরে ঘুরে ঘরে প্রচার করেছেন যুক্তিবাদের কথা। ভারতবর্ষের মানুষ যেখানে পরম্পরাগতভাবেই গুরুমুখী, অবতারবাদের। রমরমা যে ভারতবর্ষে, সেখানে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য নয়; সেই শ্রমসাধ্য এবং আপাত কঠিত কাজকেই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন প্রেমানন্দ। তথাকথিত 'গডম্যান'-দের অলৌকিক শক্তির প্রকাশ হিসাবে দেখানো বুজরুকি-এর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ও তা প্রচারের কাজে আমৃত্যু ক্লান্তিহীন ছিলেন প্রেমানন্দ। কায়েমী স্বার্থের ধারকেরা বহু প্রলোভন দেখিয়েছে, দেখিয়েছে ভয়। হত্যার হুমকি এসেছে স্রোতের মতো। শুধু হুমকিই নয়, প্রাণে মারারও চেষ্টা হয়েছে প্রেমানন্দকে কিন্তু কোন কিছুই দমাতে পারেনি তাঁকে। যুক্তিবাদের প্রচারে মৃত্যুভয়কেও জয় করে পথে নেমেছিলেন প্রেমানন্দ। ভারতের যুক্তিবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে এমন উদাহরণ বিরলপ্রায় বললে ভুল হয় না।

প্রেমানন্দ যখন গুরুর খোঁজে উদ্‌ভ্রান্ত তখন যুক্তিবাদী আন্দোলনের ধ্বজা তুলে প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কা কাপাচ্ছেন ডাঃ থোম্মা কোভুর নামের এক যুক্তিবাদী।

এরপর 4 পাতায়

ভূ-উষ্ণায়ণ এবং বন ও বন্যপ্রাণী

'গেবাল ওয়ার্মিং' বা ভূ-উষ্ণায়ণ সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে পরিচিত ও বহু চর্চিত একটি 'শব্দ'। পৃথিবীর বায়ুমন্ডল এবং সমুদ্রের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিরই অপর নাম এই ভূ-উষ্ণায়ণ। সারা পৃথিবীর শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষ আজ চিন্তিত কীভাবে এটিকে রোধ করা যায় এই ভেবে। মহাজাতি সংঘের পরিচালনায় United Nations Environment Programme (UNEP) এর অধীনে 'Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC)' গঠন করে ২০০৭ সালে 'বালি' আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলনে গালভরা বহু চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে এটি রুখতে। বাস্তবে, সেভাবে সাফল্য আসেনি পৃথিবীর আপামর জনসাধারণের কাছে।

এদিকে অসময়ে প্রবল বৃষ্টি, খরা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, প্রবল জলোচ্ছ্বাস এবং দাবানল পৃথিবীর বুকে অব্যাহত। তাদের থাবা থেকে কোন মুক্তি নেই। দিনদিন এগুলির পরিমাণ এবং তীব্রতা ক্রমশঃ বেড়েই চলছে। পৃথিবীর জলবায়ুর খামখেয়ালীপনার কারণ খুঁজতে আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত প্যানেল একবাক্যে জানিয়েছে যে, শিল্প বিপ্লবের পর থেকে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে বায়ুমন্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে — আর তাতেই জলবায়ুর সব পরিবর্তন।

বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বাড়লে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বাড়ে 'গ্রিন হাউস এফেক্ট' নিয়মে। ১৮২৪ সালে

এরপর 2 পাতায়

জীবন্ত জীবাশ্ম টুয়াটারা

পৃথিবীর আদিম যুগের বহু প্রাণী আজ অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে নানা কারণে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা তাদের অনেকেরই অস্তিত্বের কথা নানাভাবে জানতে পেরেছেন। এদের জীবাশ্ম (Fossil) পাওয়া গিয়েছে পৃথিবীর নানা জায়গায়। কিন্তু জীবাশ্ম অথচ জীবন্ত এই ব্যাপারটা কিরকম? বিস্ময়কর হলেও, ব্যাপারটি সত্য। কয়েক কোটি বছর আগে আবির্ভূত এক প্রাণী, নাম টুয়াটারা, আজও পৃথিবীর বুকে বেঁচে আছে। এই প্রাণিটি ছিল সরীসৃপ শ্রেণির এবং এর বৈজ্ঞানিক নাম 'স্ফেনোডন পাঙটেটাস' (**Sphenodon punctatus**)। এই বর্গের সমস্ত প্রাণী আজ বিরল, শুধু

এরপর 6 পাতায়

ভূ-উষ্ণায়ণ

1 পাতার পর

প্রথম এই ঘটনার কথা বর্ণনা করেন বিজ্ঞানী জোসেফ কুরিয়ার। অবশ্য ১৮৯৬ সালে সুইডিস বিজ্ঞানী আরহেনিয়াস প্রথম এটির পরিমাণগত তথ্য অনুসন্ধান করেন। জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো, জঙ্গল কেটে সাফ করে দেওয়ার জন্য, কৃষিকাজের জন্য, কলকারখানার প্রয়োজন সহ প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, মিথেন, ইথেন প্রভৃতি গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বাড়ে। National Ocenic and Atmosphetic Administration (NOAA)-এর বিজ্ঞানীরা ১৯৯৮ সালে জানান যে ১৯৯৭ সালে পৃথিবীর তাপমাত্রা ছিল গত শতাব্দীর গড় তাপমাত্রার চেয়ে এক ডিগ্রি বেশি। এদিকে নাসা-র জলবায়ুবিদ্‌রা বলেছেন, শতাব্দীর মধ্যে সবচেয়ে উষ্ণতম বছর ছিল ২০০৫।

পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের গড় ১৯৯০ সালে ছিল 353ppm (পার্টস পার মিলিয়ান বাই ভলিউম) এবং প্রতিবছর গড়ে 1.8 ppm বাড়ছে। যা অবশ্য ১৯৫৮ সালে ছিল 315 ppm এবং বৃদ্ধির বার ছিল বছরে 0.6 ppm। আবার, ১০০০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডের গাঢ়ত্ব ছিল 280 ppm।

এদিকে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তঃসরকারী প্যানেল (IPCC)২০০১ সালের রিপোর্টে জানিয়েছে যে, ১৯৯০ সাল থেকে ২১০০ এর মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১.৪ থেকে ৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে।

গ্রিনহাউস গ্যাস এবং তার প্রভাব

সূর্য থেকে নির্গত শক্তির সাহায্যেই পৃথিবীর জলবায়ু এবং আবহাওয়া পরিচালিত হয়। সূর্য থেকে বিকিরিত শক্তি পৃথিবীর পৃষ্ঠে এসে পড়ে। ফলস্বরূপ, পৃথিবী পৃষ্ঠ গরম হয়। পৃথিবী থেকে কিছু তাপশক্তি মহাকাশেই আবার বিকিরিত হয়। সূর্য থেকে নির্গত এই শক্তি বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করার সময় ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যুক্ত হয়। পৃথিবী দ্বারা শোষিত হওয়ার পর উদ্‌বৃত্ত তাপশক্তি পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত হওয়ার সময় বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যুক্ত হয়। এই বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের শক্তির ক্ষেত্রে বায়ুমন্ডলে এদের ভেদ্যতা অনেক কম। বায়ুমন্ডলে উপস্থিত গ্রিন হাউস গ্যাস গুলো দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণকে ধরে রাখে, যার ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়ে যায়।

শীতকালীন দেশগুলোতে কাচের ঘরে (Green House) বা গ্রিন হাউসে গাছপালা রাখা হয়। সেখানেও একই নিয়মে কাজ হয়। ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সহায়ক উপযুক্ত তাপমাত্রা সহজেই পাওয়া যায়। তাই এই ঘটনাকেই 'গ্রিন হাউস এফেক্ট' বলা হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, 'গ্রিন হাউস এফেক্ট' ছাড়া পৃথিবীতে জীবজগতের অস্তিত্বই সম্ভব হতো না। বায়ুমন্ডল এক্ষেত্রে একটি চাদরের কাজ করে থাকে। এই প্রাকৃতিক চাদর ছাড়া পৃথিবীর তাপমাত্রা হতো বায়ুমন্ডলহীন চাঁদের মতো। দিনের বেলা ২২৫ ডিগ্রি ফারেন হাইট (১০৭০ সেলসিয়াস) এর মধ্যে। এই তাপমাত্রা জীবজগতের পক্ষে সহায়ক নয়। কিন্তু, সমস্যাটি হল বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস গুলির ক্রমশঃ গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি পাওয়া। ক্রমাগত বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পরিবেশ ও জীবজগতের পক্ষে ক্ষতিকারক। এ নিয়ে বহু বিতর্ক আছে, তবে সমীক্ষা বলছে, বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির গাঢ়ত্ব যদি বর্তমান অবস্থায় থাকে তবে পৃথিবীর তাপমাত্রা আরও ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে।

বন ও বন্যপ্রাণীর উপরে উষ্ণায়নের ক্ষতিকারক প্রভাব

পরিবেশ এবং মানুষের উপর ভূ-উষ্ণায়নের নানান ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ে। এর প্রভাবে বরফের আচ্ছাদন গলছে, সমুদ্রতলের উচ্চতা বাড়ছে, আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটছে, কৃষিকাজে ব্যাঘাত ঘটছে, বিভিন্ন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আবহাওয়ার এসব খামখেয়ালীপনার ফলস্বরূপ বহু বন ও বন্যপ্রাণী তীব্র সংকটের মুখে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের দরুন বেশ কিছু প্রজাতি তাদের বাসস্থান ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। বহু প্রজাতি বিলুপ্তির প্রহর গুনছে। আবার, অন্য কিছু প্রজাতির বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে। এদের জীবনযাপনের প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সময়সূচীর পরিবর্তন ঘটছে, কোনও একটি অঞ্চলে খাদ্য-খাদক ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটতে পারে।

উদ্ভিদ জগতের উপর প্রভাব

পৃথিবীর উষ্ণায়ণ সম্পর্কে বিশিষ্ট পরিবেশবিদ মিখাইল এ ভেদিযুশকিন তার সমীক্ষায় জানিয়েছেন এর ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠে উদ্ভিদ জগতের পরিবর্তন ঘটতে পারে। পাশাপাশি, অরণ্য অঞ্চলের কিছুটা বৃদ্ধি ঘটবে কিন্তু অরণ্য অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য এলাকার উদ্ভিদের পরিমাণ কমবে। তাঁর মতে, উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন গুলো হলো —

তুন্দ্রা অরণ্যের পরিবর্তন। এই অরণ্য নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ঋতু নির্ভর চিরহরিৎ অরণ্য, শীতল পর্ণমোচী প্রভৃতি অরণ্যে পরিবর্তিত হচ্ছে। এই ধরনের অরণ্য বর্তমানে রাশিয়ার মেরুবর্তী অঞ্চল, উত্তর স্ক্যান্ডিনেভিয়া, আইসল্যান্ড, কানাডা এবং আলাস্কায় দেখা যায়। অরণ্য নয় এমন বিস্তৃত অঞ্চল তৈরি হওয়া, যেখানে বিভিন্ন ধরনের গুল্ম ও ঘাস দেখা যায়।

নাতিশীতোষ্ণ, চিরহরিৎ অরণ্য, গ্রীষ্ম ও বৃষ্টিপ্রধান অঞ্চলের অরণ্য, পর্ণমোচী চিরহরিৎ অরণ্য প্রভৃতি কমছে। এই ধরনের অরণ্যের পরিবর্তে সেখানে গুল্মযুক্ত তৃণভূমির উদয় হচ্ছে। নতুন নতুন জায়গায় গুল্মভূমি তৈরি হচ্ছে, আবার কোথাও কোথাও তৃণভূমির পরিমাণ বাড়ছে। টেম্পল টেক্সাসের উদ্ভিদ বাস্তুতন্ত্রাবিদ এইচ.ওয়ানে পলি-র মতে, এর কারণ হল গত ২০০ বছরে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি। টেক্সাসের বিস্তৃত এলাকায় তৃণভূমির চরিত্র বদল ঘটছে। পরবর্তী শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে 'সুগার মেইপল' কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়ায় ব্রিচ, হেমলক, বিচ প্রভৃতি বৃক্ষ ৩০০-৬০০ মাইল উত্তরে সরে যাবে।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানিয়েছেন যে, পৃথিবীর উষ্ণায়নের ফলে দেশের ২০ থেকে ৫০ শতাংশ এলাকা বর্তমান উদ্ভিদ

এরপর ৩ পাতায়

ভূ-উষ্ণায়ণ

2 পাতার পর

প্রজাতির পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের দ্বিগুণ বৃদ্ধি ঘটলে তুন্দ্রা অঞ্চলে আকার ৩০ শতাংশ কমে যাবে।

প্রাণী জগতের উপর প্রভাব

ভূ-উষ্ণায়নের ফলে বিভিন্ন প্রজাতির জীবকুল উত্তরের দিকে বা অধিক উচ্চতায় সরে যাচ্ছে। বিজ্ঞানী ক্যামিলে পারমেসান ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত তার গবেষণায় দাবী করেন যে, এডিথস চেকারপোস্ট নামে এক ধরনের ছোট্ট প্রজাপতি তাদের বসবাসের অঞ্চল পরিবর্তন করেছে। তিনি ১৫১টি অঞ্চলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখান যে, বসতি অঞ্চলের দক্ষিণ অংশে বিভিন্ন প্রাণীর সংখ্যা কমছে। কানাডার তুলনায় মেক্সিকোয় তাদের বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা চার গুণ। তিনি দাবি করেন যে, প্রজাতির দল অধিক উচ্চতায় অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা জায়গায় সরে যাচ্ছে।

সামুদ্রিক জীবেরাও উষ্ণতা সম্পর্কে খুবই সংবেদনশীল। ফলে উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেশকিছু প্রজাতি স্থান পরিবর্তন করে। বেশ কিছু প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে গেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার মন্টেরে উপসাগরে করা সামুদ্রিক প্রজাতির গণনা রিপোর্ট থেকে জানা যায় ১৯৯৩-৯৪ সালে ১৯৩১ সালের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক উষ্ণতায় থাকতে পছন্দ করে এমন প্রজাতির সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধ পেয়েছে। পাশাপাশি, অপেক্ষাকৃত শীতল জল পছন্দ করে এমন প্রজাতির সংখ্যা এই সময়ের মধ্যে কমেছে।

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া এবং তাসমানিয়া এবং উত্তর মেরুপ্রদেশের মাঝামাঝি ছোট্ট ম্যাকুয়ারি দ্বীপেও এই একই ঘটনা ঘটেছে। স্থলভাগ থেকে নদীনালার মাধ্যমে ভেসে আসা দূষিত ও উষ্ণ জল, বিভিন্ন কলকারখানা থেকে নির্গত দূষিত বর্জ্য প্রভৃতির ফলে সমুদ্র জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার সরাসরি প্রভাব পরে প্রবালদের উপর। এর প্রভাবে দিনের পর দিন প্রচন্ডরকমভাবে 'প্রবাল গুলো' মরে যাচ্ছে। ১৯৭৯-৮০ সালে ৬০টি অঞ্চলের উপর করা একটি সমীক্ষার রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, কোনও কোনও জায়গায় শতকরা ৯৫ ভাগ প্রবাল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

উত্তর মেরু অঞ্চলের ক্রমাগত উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সীলের জীবন ভীষণভাবে বিপন্ন। এতে সীলের শিশুদের মৃত্যুর হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ, তাদের বরফের আবাসস্থল ভেঙে পড়ছে। তাছাড়া, সীলের প্রাকৃতিক খাদ্য মাছদের সংখ্যা ভীষণভাবে কমে যাচ্ছে ফলে এদের তীব্র খাদ্যাভাব দেখা যাচ্ছে।

এই সীলের সংখ্যা কমা এবং জলে ভাসমান বরফের সংখ্যা কমার ফলে মেরুঅঞ্চলের 'রাজা' হিসেবে চিহ্নিত এবং পরিচিত মেরুভল্লুকের অস্তিত্ব প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখে। বর্তমানে এরা তীব্র সংকটাপন্ন।

মিষ্টি জলে বসবাসকারী প্রজাতিরা যেমন, স্যামন, ট্রাউট, মাসকি সহ বেশ কিছু প্রজাতির মাছেরা জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। জলের তাপমাত্রা মাত্র ৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট বাড়লেই অনেক ট্রাউটই মারা যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশপ্রেমী সংগঠন এনভায়রণমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি (EPA) ১৯৯৬ সালে একটি সমীক্ষার রিপোর্টে উল্লেখ করেছে যে, অন্ততঃ ২৪টি প্রদেশের ঠান্ডা জলের মাছ আগামী দিনে ৫০ থেকে ১০০ শতাংশ হারিয়ে যেতে পারে।

উত্তর আলাস্কার তীরবর্তী তটভূমিতে প্রাপ্ত পরিযায়ী বল্গা হরিণ ১৯৯০ সাল নাগাদ তীব্র খাদ্য সংকটে পড়েছিল কারণ ঐ বছরেই সেখানে বসন্তকাল বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছিল। ফলস্বরূপ, তাদের প্রধান খাদ্য গুল্মজাতীয় উদ্ভিদের বীজ শুকিয়ে যায়।

মেরু ভল্লুকেরা শিকার ধরার জন্য সমুদ্রে ভেসে থাকা বরফগুলো ব্যবহার করে। কিন্তু, ভূ-উষ্ণায়ণের জন্য ভেসে থাকা বরফের মধ্যেকার দূরত্ব বাড়ছে — ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জলে ডুবেই এদের মৃত্যু ঘটছে।

বহু পরিযায়ী পাখিদের অস্তিত্ব তীব্র সংকটাপন্ন। বিজ্ঞানীরা বহুক্ষেত্রে দেখেছেন যে, এদের পরিযানকাল ও চক্র ব্যাহত হচ্ছে ভূ-উষ্ণায়ণের ফলে। ফলে এরা ক্রমশঃ আরও উত্তরের দিকে সরে যাচ্ছে। এদের ডিম ফুটানোর হার, বাচ্চার জন্মহার ক্রমাগত কমে আসছে। অনেক ক্ষেত্রে বহু নিষিক্ত ডিম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই ভূ-উষ্ণায়ণের জন্য। উপযুক্ত সময়ে পর্যাপ্ত খাদ্য ও বাসস্থানের অভাবে এরা ভীষণভাবে সংকটাপন্ন।

মেরুশেয়াল, নীলতিমি, টুনা মাছ প্রভৃতি আজ বিলুপ্ত প্রায় প্রাণীতে নিজেদেরকে পরিণত করে চলছে। এদের স্বাভাবিক আবাসস্থল এবং খাদ্য উভয়েরই তীব্র সংকট।

সমুদ্রে P ^{H} (অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের সূচক) এর মান অনেকটাই কমে আসছে — আগামী দিনেও কমবে। ফলে সমুদ্রজল আরও আম্লিক হচ্ছে — ফলে বহু প্রবাল, কাঁকড়া বা ঝিনুক তাদের খোলক তৈরি করতে পারছে না।

— রাজা রাউত, ৯৪৭৪৪১৭১৭৮

ভোপাল গ্যাস কান্ডের রায়ের প্রতিবাদে কাঁচরাপাড়ায় পথসভা

১৩ জুন, কাঁচরাপাড়া ঃ ১৯৮৪ সালের ভোপাল গ্যাস বিপর্যয়ে ৭ জুন নিম্ন আদালত মাত্র ৮ জনকে ২ বছরের কারাদণ্ড ঘোষণা করেন, দোষীরা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই জামিন পেয়েছেন। ১৩ জুন, কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবারের কর্মীরা ভোপাল গ্যাস কান্ডের পুনর্বিচার চেয়ে স্টেশনে এক প্রচার সভার আয়োজন করেন।

বিজ্ঞান দরবারের সম্পাদক বিজয় সরকার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জানান ইউনিয়ন কার্বাইড থেকে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়েছিল। এর থেকে প্রমানিত হয় যে কারখানায় কোনও দূষণ প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ১৯৮২ সালে ছোটখাটো ২টি দুর্ঘটনা ঘটেছিল, কোম্পানী কোনওরকম শিল্প নিরাপত্তা নেয়নি। ফলে গ্যাস বিপর্যয়ে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়।

বিজ্ঞানকর্মী জয়দেব দে জানান, ভোপাল গ্যাস বিপর্যয় আসলে একটি পরিকল্পিত গণহত্যা, চেয়ারম্যান ওয়ারেন অ্যান্ডারসনকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত।

এরপর 6 পাতায়

বাসব প্রেমানন্দ

1 পাতার পর

তিনি তথাকথিত অলৌকিক শক্তির অধিকারীদের উদ্দেশ্যে এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন। চ্যালেঞ্জের মমার্থ হ'ল যথাযথ পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিয়ে কেউ যদি নিজের অলৌকিক ক্ষমতার অকাট্য প্রমান দিতে পারেন তবে কোভুর তাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবেন। অনেকেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু অলৌকিক ক্ষমতার প্রমান দিতে না পারায় জামানতের টাকা হারান। কোভুর শুধু শ্রীলঙ্কার মধ্যেই তাঁর কর্মকান্ডকে আটকে না রেখে অন্য দেশেও যুক্তিবাদের প্রসারে মনোযোগী ছিলেন। বহু দেশে সফরে গিয়ে তিনি স্বঘোষিত গডম্যানদের তথাকথিত অলৌকিক কান্ডকারখানা হাতে কলমে করে দেখাতেন এবং তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতেন।

১৯৭৮ সালে কোভুরের মৃত্যু হয়। কোভুর-এর মৃত্যুর পর প্রেমানন্দ কোভুরের চ্যালেঞ্জ বজায় রাখেন এবং অলৌকিকতার প্রমান দিতে পারলে সেই অলৌকিক শক্তির অধিকারীকে এক লাখ টাকা পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করেন। সারা জীবন তিনি বহু 'গডম্যান'-এর মুখোমুখি হয়েছেন, ফাঁস করেছেন তাদের বুজরুকি আর ভন্ডামি। তবে সাঁই বাবার সঙ্গে তাঁর সঙ্ঘাত সবদিক দিয়েই তুলনাহীন। প্রথমদিকে এক লাখ টাকার লোভে অনেকেই প্রেমানন্দের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নাস্তানাবুদ হয়েছেন পরবর্তীকালে গডম্যানেরা সতর্ক হয়ে যান এবং প্রেমানন্দের হাত থেকে বাঁচতে তথাকথিত স্বঘোষিত গডম্যানদের আশ্রমের আশে পাশে প্রেমানন্দের আসার অলিখিত নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। তবে তাতেও দমানো যায়নি বাসব প্রেমানন্দকে। সাঁইবাবা আশ্রমের ভিতরের খবর জানতে মাথা ন্যাড়া করে ছদ্মবেশে তিনি পৌঁছে যান আশ্রমের অন্দর মহলে। সংগ্রহ করে আনেন হাড় হিম করা তথ্য। গডম্যানরাও অবশ্য ছেড়ে কথা বলেননি। তাদের অনুগামী ভক্তরা এবং ভাড়া করা দুষ্কৃতীরা নানাভাবে আক্রমণ নামিয়ে এনছেন প্রেমানন্দের উপর। তাঁর নাক এবং ঠোঁটের উপর পাথরের আঘাতের চিহ্ন চিরস্থায়ী হয়েছিল। তাঁর মোটর বাইককে রহস্যজনকভাবে ধাক্কা দিয়েছিল ট্রাক, যার পিছনে অনেকেই ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েছিলেন। তাঁর পা এমনভাবে জখম হয়েছিল যে চিরস্থায়ীভাবে মেটাল রড লাগিয়ে চিকিৎসা করতে হয়েছিল। তাঁকে একবার আগুনে পুড়িয়ে মারারও চেষ্টা হয়েছিল। যখন তিনি আগুনের উপর দিয়ে হাঁটার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন তাকে ধাক্কা দিয়ে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়। সেই আগুনে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ভাঙা কাঁচের টুকরো যাতে সরাসরি মস্তিষ্কের উপর তীব্র তাপের অনুভূমিত পৌঁছে যায়। আর দিনরাত হুমকি ফোন তো ছিলই। সাঁইবাবার উপর তাঁর প্রথম বই 'দি লিওর অফ মিরাক্যালস' বেরোলে সাঁইবাবার ভক্তরা এ বইয়ের বহ্নোৎসব করেছিল। প্রতিবাদ যে নিছক গান্ধীবাদী ছিল না তা বলাই বাহুল্য মাত্র। শুধু কি বাইরের লোক? আত্মীয় স্বজনেরাও খুব সুনজরে দেখতেন না প্রেমানন্দকে। তাঁর শ্যালকও তার বাড়ী প্রেমানন্দকে ভাড়া দিতে চাননি পাছে তার ছেলেরা প্রেমানন্দের সংস্পর্শে এসে নাস্তিক (এ দেশের সাধারণ লোকে এখনও যুক্তিবাদীকে নাস্তিক হিসাবেই দেখে থাকে) হয়ে ওঠে। কিন্তু এসবে দমবার পাত্র ছিলেন না প্রেমানন্দ। আমৃত্যু তিনি তাঁর লড়াই জারী রেখেছিলেন। সাঁইবাবার অলৌকিক দাবির বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই শুরু হয় মোটামুটি ১৯৭৫ সাল থেকে। সাঁইবাবার অলৌকিক বিভূতি (ফোটো ফ্রেম থেকে ছাই ঝরে পড়া) বা শূন্য থেকে সোনা তৈরি করার তথাকথিত অলৌকিকতার বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই অবিস্মরণীয়।

অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টে সাঁই বাবার বিরুদ্ধে 'ইন্ডিয়ান গোল্ড কন্ট্রোল অ্যাক্ট' অনুযায়ী মামলা দায়ের করেছিলেন প্রেমানন্দ। অভিযোগ বাতাস থেকে সোনা তৈরি করে সাঁইবাবা গোল্ড কন্ট্রোল অ্যাক্টের ১১ নম্বর ধারা ভেঙেছেন। সোনা তৈরির জন্য গোল্ড কন্ট্রোল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের প্রয়োজনীয় অনুমতি তিনি নেননি। অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট কেসটি ডিসমিস করে দিলেও সমসময়ে এই কেসটি বেশ আলোড়ন তুলেছিল। ১৯৯৩-এর ৬ই জুন সাঁইবাবার আশ্রমে ৬ জন খুনের বিতর্কিত ঘটনাও তিনি জনসমক্ষে আনেন। তাঁর 'মার্ডার ইনি সাঁইবাবাস বেডরুম' শীর্ষক আটশো পাতার বইটি আশ্রমের বহু কেচ্ছা কেলেঙ্কারির জীবন্ত দলিল।

যুক্তিবাদী আন্দোলনের প্রসারের লক্ষ্যে দুদশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি 'ইন্ডিয়ান স্কেপটিক' (Indian Skeptic) নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। তিনি একাধারে ছিলেন এই পত্রিকার মালিক, প্রকাশক, সম্পাদক। পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি প্রতিদিন নিয়ম করে সাতটি করে গ্রামে চলত তাঁর প্রচারাভিযান। মাসে অন্তত কুড়ি দিন চলত এরকম অভিযান। যুক্তিবাদ বিষয়ে ৭০০০-এর বেশি বক্তৃতা দিয়েছেন প্রেমানন্দ, লিখেছেন ৩৬টি বই, বুজরুকি ভন্ডামির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ম্যাজিক শিখিয়েছেন ১০০০-এর বেশি অনুগামীকে। প্রেমানন্দ প্রতিষ্ঠা করেছেন 'ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান র‍্যাশন্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন' (FIRA)- যে সংগঠন ভারতবর্ষে যুক্তিবাদের প্রচার ও প্রসারে এক অগ্রণী সংগঠন।

যুক্তিবাদের প্রসারের লক্ষ্যে গ্রেফতারিও বরণ করেছেন প্রেমানন্দ। ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি ৫০০ স্বেচ্ছাসেবী যুক্তিবাদী নিয়ে পুটোপার্থি'র সাঁইবাবার প্রধান আশ্রমের দিকে অভিযান শুরু করেন তখন সহযোগীদের সাথে পুলিশ তাঁকেও গ্রেপ্তার করে। ভারতীয় গডম্যানদের দেখানো নানা রকম ভেলকির রহস্যভেদ করে সহজবোধ্য ভাষায় তা প্রচার করেছেন তিনি। তাঁর 'সায়েন্স অ্যান্ড মিরাক্যালস'-এ এরকম ১৫০টি রহস্যের ব্যাখ্যা আছে। আরো হাজার দেড়েক রহস্য নিয়ে তাঁর লেখা রয়ে গেছে গ্রন্থভুক্তির অপেক্ষায়। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত বইগুলো হ'ল 'লিওর অফ মিরাক্যালস', 'ডিভাইন অক্টোপাস', দি স্টর্ম অফ গডম্যান', 'গডম্যান অ্যান্ড ডায়মন্ড স্মাগলিং', 'সত্যসাঁই গ্রীড', 'সত্য সাঁইবাবা অ্যান্ড গোল্ড কন্ট্রোল অ্যাক্ট', 'সত্য সাঁইবাবা অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস অ্যাক্ট', 'ইনভেস্টিগেট বালাযোগী' ইত্যাদি। ইংরাজী ভাষার পাশাপাশি মালায়ালাম ভাষাতেও লিখেছেন বেশ কিছু বই ও পুস্তিকা। যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসারের লক্ষ্যে ৪৯টি দেশ ভ্রমণ করেছিলেন প্রেমানন্দ।

২০০৬ সালে প্রেমানন্দের ক্যানসার ধরা পড়ে। ঐ বছরের নভেম্বর মাসে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। শারিরীক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ২০০৭ সালের

এরপর 6 পাতায়

তাঁত বস্ত্রে ভেষজ রঙ

1 পাতার পর

বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত কিছু কিছু রাসায়নিক রঙ এর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া মানুষকে সচেতন করে তোলে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে রাসায়নিক রঙ এর সীমাহীন ব্যবহার প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করে। ফলে আমেরিকা সহ পশ্চিমী দুনিয়ার কিছু কিছু দেশে বস্ত্রশিল্পে নির্দিষ্ট কিছু রাসায়নিক রঙের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বর্তমানে বিদেশে এবং ভারতবর্ষেও ভেষজ রঙ-এর ব্যবহারে প্রস্তুত কাপড়ের চাহিদা ক্রমবর্ধমান কারণ হিসাবে দেখা যায় এর ব্যবহার ত্বক সহ শরীরের কোন ক্ষতি করে না, সৌন্দর্য্যবর্ধনে ও স্বাচ্ছন্দ রক্ষার্থে সাহায্য করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত কিছু কিছু রাসায়নিক রঙ এর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া মানুষকে সচেতন করে তোলে। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখা যায় যে, কিছু রাসায়নিক রঙ-এর ভেতর নির্দিষ্ট ৩০টি অ্যামিন গ্রুপস বর্তমান। যাদের প্রয়োগে রঞ্জিত বস্ত্রসম্ভার ব্যবহারে ত্বকে হাজা, অ্যালার্জিজাত বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, ভেষজ রঙ দামেও সুলভ। ফলে বিদেশে উক্ত রঙ-এ রঞ্জিত বস্ত্রের আমদানি বা বিক্রয় সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। উক্ত অ্যামিন গ্রুপস ব্যতিরেকে নিরাপদ কিছু রঙের তালিকা হল —

অ্যাসিড রঙ ঃ ১। অ্যাসি অরেঞ্জ ১৯ (রেডিশ রেঞ্জ), ২। অ্যাসিড রেড ১৫৭ (ব্রাইট রেড), ৩। অ্যাসিড রেড ১০২, ৪। অ্যাসিড রেড ৩৭৪ (ব্রাইট ইয়োলিশ রেড), ৫। অ্যাসিড রেড ৩৭ (ব্লুইশ রেড), ৬। অ্যাসিড রেড ১৯১ (ইয়োলিশ রেড), ৭। অ্যাসিড ভাওলেট ৭২ (ব্রাইট ব্লুইশ ভাওলেট ৭২ (ব্রাইট ব্লুইশ ভাওলেট, ৮। অ্যাসিড ভাওলেট ১৩ (ব্রাইট রেডিশ ভাওলেট, ৯। অ্যাসিড ব্ল্যাক ২৪ (ব্লুইশ ব্ল্যাক)।

ডাইরেক্ট রঙ ঃ ১। ডাইরেক্ট ইয়েলো ১৫ (রেডিশ ইয়োলো), ২। ডাইরেক্ট অরেঞ্জ ১০২ (রেডিশ অরেঞ্জ), ৩। ডাইরেক্ট রেড ৮১ (ব্রাইট রেড), ৪। ডাইরেক্ট রেড ১২০, ৫। ডাইরেক্ট রেড ২৩ (রেড), ৬। ডাইরেক্ট রেড ৩১ (ব্রাইট ব্লুইশ রেড), ৭। ডাইরেক্ট রেড ৪ (ব্রাইট ইয়োলিশ রেড), ৮। ডাইরেক্ট ভাওলেট ৬৬ (ভাওলেট), ৯। ডাইরেক্ট ব্রাউন ১১২ (রেডিশ ব্রাউন), ১০। ডাইরেক্ট ব্ল্যাক ৫১ (ব্লুইশ গ্রে), ১১। ডিসপার্স ব্লু ৩৪ (ব্লু), ১২। ডিসপার্স রেড ৩৩৪ (ব্রাইট রেড), ১৩। ডিসপার্স ইয়েলো ২৬ (রেডিশ ইয়েলো)।

সাধারণত সূতিবস্ত্র, রেশ, পশম এবং পাট তন্তু বা তন্তুজাত বস্ত্র অধিকাংশ ভেষজ রঙ ধরে রাখতে পারে না, ফলে এই রঙ ধরে রাখার জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে কিছু প্রাকৃতিক সামগ্রীর সাহায্য নিতে হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় মডার্নটি এবং উক্ত প্রাকৃতিক সামগ্রীকে বলা হয় মর্ডানট। সঠিক মডার্নটি নির্বাচন এবং মডার্নটিং পদ্ধতির উপর তন্তু বা তন্তুজাত বস্ত্রের রঙের উজ্জ্বলতা, স্থায়িত্ব এবং গভীরতা নির্ভর করে।

বর্তমান বাজারে সুলভ মূল্যে বা পদ্ধতিতে প্রাপ্য কিছু ভেষজ রঙের তালিকা ঃ বাবলা গাছের ছাল ও আঠা থেকে বাদামী রঙ, ২। মাদার গাছের শিকড় থেকে লাল রঙ, ৩। নীল গাছের পাতা থেকে নীল রঙ, ৪। পলাশ বা তেসুর ফুল থেকে হলুদ রঙ, ৫। কাঁঠাল গাছের ছাল থেকে হলুদ রঙ, ৬। আম গাছের ছাল থেকে সবুজ রঙ, ৭। বেদানার ছাল থেকে হলুদ রঙ, ৮। জাম গাছের ছাল থেকে বগুলী রঙ, ৯। সেগুন গাছের পাতা থেকে লাল রঙ, ১০। বাসক গাছের পাতা থেকে হলুদ রঙ, ১১। গাঁদার ফুল থেকে হলুদ রঙ, ১২। পেঁয়াজের খোসা থেকে হলুদ রঙ, ১৩। শিউলি ফুল থেকে কমলা রঙ, ১৪। চা পাতা থেকে খয়েরী রঙ প্রভৃতি। আবার শুধু ভেষজ রঙ ভালো হলেই হবে না, একে টিকিয়ে রাখার জন্য জলের গুরুত্বও অপরিসীম। বিশুদ্ধ জল সম্পর্কেও নিশ্চিত হতে হবে। এদের প্রত্যেকের রঙ তৈরির পদ্ধতি আলাদা আলাদা।

ভেষজ পদার্থ থেকে রঙ নিষ্কাশন

বাবলা ঃ এই গাছের ছাল থেকে হলদে বাদামী রঙ থেকে গাঢ় বাদামী রঙ বিভিন্ন মাত্রায় পাওয়া যায়। এই গাছের মূল ছোট ছোট করে কেটে শুকিয়ে গুঁড়ো করতে হবে। এই গুঁড়ো ও জল ১ঃ২০ অনুপাতে নিয়ে ৩০ মিনিট ফুটিয়ে ১৫ মিনিট রেখে দিয়ে পরিশ্রুত করে নিতে হবে।

ডালিম ঃ ডালিমের ফলের খোসা থেকে হলুদ রঙ বিভিন্ন মাত্রায় পাওয়া যায়। এই ফলের খোসা ছোট ছোট করে কেটে শুকিয়ে গুঁড়ো করতে হবে। এই গুঁড়ো এবং জল ১ঃ২০ অনুপাতে নিয়ে ৩০ মিনিট ফুটিয়ে ১৫ মিনিট রেখে দিয়ে পরিশ্রুত করে নিতে হবে।

সবুজ ঃ সাধারণতঃ সবুজ রঙ হলুদ এবং নীল রঙের মিশ্রণে তৈরি করা হয়। এই রঙ এর গভীরতা নির্ভর করে হলুদ এবং নীল রঙের পরিমানের ওপর। হলুদ রঙের পরিমান বেশি হলে হলদে সবুজ এবং নীল রঙের পরিমান বেশি হলে নীলাভ সবুজ রঙ হয়ে যায়।

কালো ঃ সাধারণতঃ কালো রঙ তৈরি করা হয় মরচে ধরা লোহার টুকরো, অর্ধেক ওজনের মোলাসেস এবং সামান্য শুকনো মহুয়া ফুল একটি পাত্রে জলের মধ্যে ১৫-৩০ দিন গাঁজিয়ে নিতে হবে। এরপর সূতো বা কাপড় উপরোক্ত দ্রবণে ডুবিয়ে মর্ডানট করে সঞ্জিথ দিয়ে রঙ করতে হবে।

ভেষজ পদার্থ থেকে রঙ নিষ্কাশনের আরও পদ্ধতি আছে। রঙ পদ্ধতির ক্রম পর্যায় —

সূতির ক্ষেত্রে ঃ ১। কাঁচামাল (সূতো), ২। পরিষ্কার করা, ৩। ধোয়া এবং শুকানো, ৪। মর্ডানটিং, ৫। ধোয়া এবং শুকানো, ৬। রঙ পাত তৈরি করা, ৭। রঙ করা, ৮। ঠান্ডা জলে ধোয়া, ৯। সাবান জলে ধোয়া, ১০। ঠান্ডা জলে ধোয়া।

উলের ক্ষেত্রে ঃ ১। কাঁচামাল, ২। ব্লিচিং, ৩। ধোয়া এবং শুকানো, ৪। মর্ডানটিং, ৫। ধোয়া এবং শুকানো, ৬। রঙ পাত্র তৈরি করা, ৭। রঙ করা, ৮। গরম জলে ধোওয়া, ৯। ঠান্ডা জলে ধোওয়া।

সিল্কের ক্ষেত্রে ঃ কাঁচামাল, ডিগামিং, ধোওয়া এবং শুকানো, মর্ডানটিং, ধোওয়া এবং শুকানো, রঙ পাত্র তৈরি করা, রঙ করা সাবানজলে ধোওয়া, ঠান্ডা জলে ধোওয়া।

রঙ করার পদ্ধতি ঃ মঞ্জিথ রঙ এর সাহায্যে সূতির লাল রঙ, পলাশ বা তেসু এর সাহায্যে সূতির হলুদ রঙ, ভলু এর সাহায্যে সূতির বাদামী রঙ কিভাবে করব?

ক) সূতো কাপড় বা প্রথমে ৫ শতাংশ রিঠা, ৩ শতাংশ সাবান, ১ শতাংশ সোডা দিয়ে এক ঘণ্টা ফোটাতে হবে, এরপর ভালো করে ঠান্ডা

এরপর 7 পাতায়

জীবন্ত জীবাশ্ম টুয়াটারা

1 পাতার পর

টুয়াটারাই আজও বেঁচে আছে এই পৃথিবীতে। এত দীর্ঘ দিনেও, এই প্রাণিটির দেহে অথবা জীবনযাত্রায় কোন পরিবর্তনই ঘটেনি। এ যেন পুরাকালের এক জীবন্ত সাক্ষী আর সেজন্যই এদের বলা হয় 'জীবন্ত জীবাশ্ম'।

টুয়াটারাকে প্রথম দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এবং তখন এদের টিকটিকি বা গিরগিটি (lizard) জাতের প্রাণী বলে ভাবা হত। পরে ১৮৬৭ সালে বিজ্ঞানীরা এই প্রাণিটিকে Rhynchocephalia বর্গের অন্তর্ভুক্ত করেন।

এদের দেখতে অনেকটা টিকটিকি জাতীয় প্রাণীর মত। 'টুয়াটারা' শব্দটির অর্থ হল 'কন্টকধারা'। প্রায় দুই ফুট লম্বা এই প্রাণিটির পিঠের মাঝখানে মাথার কাছ থেকে লেজ পর্যন্ত এক সারি কাঁটা দেখা যায়। শরীরের উপরের দিকে থাকে ছোট ছোট আঁশ আর ছোট ছোট হলুদ বিন্দু বিন্দু দাগ। গায়ের রং কালচে-বাদামী, লেজ চ্যাপ্টা ও মোটা। দাঁতগুলি ঠিক পেরেকের মত আর চার পায়ে থাকে ধারালো নখযুক্ত পাঁচটি করে আঙ্গুল। আশ্চর্য যে, এদের কপালে একটি তৃতীয় নয়ন আছে, যা অবশ্য দৃষ্টিশক্তির কাজে আসে না। এরা যথেষ্ট ঠান্ডা ও অলস প্রকৃতির, অবশ্য আত্মরক্ষার সময়ে এরা যথেষ্ট হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। খুব মন্থর এদের গতিবিধি এবং প্রায় প্রতি সাত সেকেন্ড অন্তর এরা একবার শ্বাস নেয়। প্রায় এক ঘণ্টা পর্যন্ত শ্বাস না নিয়ে এরা বেঁচে থাকতে পারে।

টুয়াটারা খুব ঠান্ডা সহ্য করতে পারে। এদের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা মাত্র ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেজন্য খুব ঠান্ডার দেশে এদের বাসস্থান। কানাডা বা নিউজিল্যান্ডে এদের আদি বাসস্থান ছিল। খাদক হিসাবে এরা মাংসাশী এবং মাকড়সা, কীটপতঙ্গ বা পাখীর ডিম এদের প্রধান খাদ্য। এরা মূলতঃ নিশাচর প্রাণী আর থাকে মাটিতে গর্ত করে। যেখানে থাকে পাখীর বাসা, সেখানেও থাকতে এরা পছন্দ করে। যে দ্বীপে পাখী নেই, সেখানে এদের অস্তিত্বও নেই। আজও এই রহস্যের কারণ রয়ে গিয়েছে অজানা। স্ত্রী-টুয়াটারা ডিম পাড়ে একসঙ্গে ১০-১২টি একটি গভীর গর্তের মধ্যে, যেগুলিকে লতাপাতা দিয়ে চাপা দিয়ে রাখে। ডিমগুলি লম্বায় প্রায় এক ইঞ্চির মত এবং প্রায় ১৫ মাস পরে, সেগুলি ফুটে বাচ্চা বের হয়। বাচ্চাগুলি বড় হতে বেশ সময় নেয় এবং এদের গড় আয়ু প্রায় ১০০ বছর।

এসবই টুয়াটারার জীবনকথা। প্রাচীনকালে এদের এক বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এদেরকে তখন 'দুর্ভাগ্যের' এক চরম প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করা হত। নিউজিল্যান্ডের মূল ভূখন্ডেই এদের প্রধানত বসবাস কিন্তু কালস্রোতে তাদের সংখ্যা কমতে কমতে প্রায় অবলুপ্তির পথে এসে এরা পৌঁছে গিয়েছে। তবে এদের বংশপরম্পরা এখানো শেষ হয়ে যায়নি। এখনও সেখানে মাত্র কয়েকটি দ্বীপে এদের দেখতে পাওয়া যায়। আশ্চর্যের কথা এই যে, একমাত্র নিউজিল্যান্ড ছাড়া পৃথিবীর আর অন্য কোনও দেশে টুয়াটারার দেখা পাওয়া যায় না এখন। আর সেখানেও মাত্র কয়েকটি দ্বীপে। এজন্যই সেখানে টুয়াটারা এক 'সংরক্ষিত' প্রাণি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। আর সেই কারণেই টুয়াটারা আজ সম্পূর্ণ অবলুপ্তির হাত থেকে বেঁচে আছে। আমাদের আশা যে, এই প্রায় অবলুপ্ত বিচিত্র প্রাণিটি বেঁচে থেকে পুরাকালের এক সাক্ষী হিসাবে 'জীবন্ত-জীবাশ্ম' হয়েই আমাদের মধ্যে বিরাজ করবে।

— ডঃ সমীর কুমার ঘোষ, ০৯৪৩৪১৫৭৭৫৩

বাসব প্রেমানন্দ

4 পাতার পর

জানুয়ারী মাসে ব্যাঙ্গালোর শহরে অনুষ্ঠিত যুক্তিবাদীদের এক সভায় তিনি যোগ দেন, সেই সভা থেকেই জন্ম নেয় ব্যাঙ্গালোর র‍্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়শন। অশক্ত শরীর নিয়েই ২০০৭-এর এপ্রিলে পুনা শহরে যোগ দেন FIRA-র ষষ্ঠ জাতীয় সম্মেলনে। ডিসেম্বর মাসে যোগ দেন কেরালা যুক্তিবাদী সংঘ-এর পঁচিশতম রাজ্য সম্মেলনে। পাশাপাশি চলছিল নিরবিচ্ছিন্নভাবে ইন্ডিয়ান স্কেপটিক প্রকাশনার কাজ। ২০০৯-এর মার্চ মাসে তামিলনাড়ুর পোদানুরে তিনি তাঁর আজীবনের স্বপ্ন, এক স্থায়ী বিজ্ঞান প্রদর্শনীর সূচনা করেন। অসুস্থ শরীর নিয়েও যিনি বিশ্রামের কথা ভাবেননি তিনি চিরবিশ্রাম নিলেন ২০০৯-এর ৪ঠা অক্টোবর। 'ইন্ডিয়া'জ চিফ ফকির বুস্টার' বা 'গুরু বুস্টার' প্রেমানন্দ ছিলেন স্বঘোষিত গডম্যানদের দুঃস্বপ্ন। তাঁরা তাঁকে আখ্যায়িত করেছিল 'রাবণ', 'শয়তান' ইত্যাদি অভিধায়। তাঁরা ভুলতে চাইবে বাসব প্রেমানন্দকে কিন্তু ভারতবর্ষে যতদিন একজনও যুক্তিবাদী থাকবে বাসব প্রেমানন্দ বেঁচে থাকবেন তাঁদের হৃদয়ে।

১৯৮৫ সালে মার্চে মাসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বি. প্রেমানন্দ অলৌকিকতা বিরোধী প্রচারে ১ মাস ব্যাপী পরিক্রমা করেন। '৮৫-এর ৮ মার্চ কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবারের ব্যবস্থাপনায় কাঁচরাপাড়া হাইস্কুলে 'অলৌকিক নয় বিজ্ঞান' বিষয়ক এক প্রদর্শনীতে বি. প্রেমানন্দ ও আরুশ্বামী অংশগ্রহণ করেন। কয়েক হাজার মানুষ সেই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন এবং অলৌকিকতা বিরোধী এক পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

— প্রকাশ দাস বিশ্বাস, এবং কি কে ও কেন (অক্টোঃ-ডিসেঃ-২০০৯)

— মুর্শিদাবাদ জেলা বিজ্ঞান পরিষদ।

ভোপাল গ্যাস

3 পাতার পর

১৯৮৪ সালের ৯ ডিসেম্বর মৃত মানুষদের স্মরণে বিজ্ঞান দরবার কাঁচরাপাড়ায় মিছিল ও পথসভা আয়োজন করেছিল। সেই সময় বিভিন্ন বিজ্ঞানকর্মীরা দাবী করেন প্রতিটি শিল্পের পরিবেশগত প্রভাব জনসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত। ১৯৮৪ সাল থেকেই ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞানকর্মীরা ভোপালের গ্যাসপীড়িত মানুষদের পক্ষে দাঁড়িয়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।

নৈহাটি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড কালচার সংস্থার প্রদীপ বসু বলেন, ভোপাল গ্যাস কান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের কৃষিক্ষেত্রে, শিল্পক্ষেত্রে যেভাবে কর্পোরেট সংস্থাগুলি বিনিয়োগ করছে, তাতে পরিবেশ ভীষণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। বক্তা দেশীয় বীজ, প্রজাতি সংরক্ষণের উপর জোর দেন।

তাঁতবস্ত্রে ভেষজ রঙ

5 পাতার পর

জলে ধুয়ে রোদে শুকোতে হবে। খ) ১০ শতাংশ ফিটকিরি এবং ১ শতাংশ টারটারিক অ্যাসিড সহযোগে এক ঘন্টা ৯০-১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফোটাতে হবে, এরপর ঠান্ডা জলে ভালো করে ধুয়ে রোদে শুকোতে হবে। গ) রঙ পাত্রে ২ শতাংশ রঙ, ১ঃ২০ অথবা ১ঃ২০ অনুপাতে জল এবং কয়েক ফোটা অ্যাসিটিক অ্যাসিড নিয়ে তার মধ্যে সুতো বা কাপড় ডুবিয়ে ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৬০-৯০ মিনিট ফোটাতে হবে। ঘ) এরপর ঠান্ডা জলে ধুয়ে সুতো বা কাপড়ের ওজনের ০.২৫ থেকে ০.৫০ শতাংশ সাবান জলে ধুয়ে আবার ঠান্ডা জলে ধুয়ে রোদে শুকোতে হবে।

জ্ঞাতব্য ঃ রঙ গাঢ় করার জন্য রঙ এর পরিমাণ ৮ শতাংশ নিতে হবে। রঙ হালকার জন্য ২ শতাংশ নিতে হবে। মাঝারির জন্য ৩ শতাংশ নিতে হবে।

উলের ব্লিচিং এর জন্য হাইড্রোজেন পার অক্সাইড ব্যবহার করতে হবে এবং রঙ এর তাপমাত্রা ৬০-৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে হবে।

সিল্কের ক্ষেত্রে ডিগামিং করতে হবে এবং রঙ এর তাপমাত্রা ৬০-৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে হবে।

নীলের সাহায্যে সূতির নীল রঙ করার পদ্ধতি ঃ

ক) সূতো বা কাপড় প্রথমে ৫ শতাংশ রিঠা, ৩ শতাংশ সাবান এবং ১.৩ শতাংশ সোডা দিয়ে এক ঘন্টা ফোটাতে হবে। এরপর ভালো করে ঠান্ডা জলে ধুয়ে রোদে শুকোতে হবে। খ) এরপর ১০ শতাংশ ফিটকিরি সহযোগে বস্তুর ১ঃ১০ থেকে ১ঃ২০ অনুপাতে জল নিয়ে ৩০ মিনিট থেকে ৬০ মিনিট, ৬০-৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফোটাতে হবে। তারপর ভালো করে ঠান্ডা জলে ধুয়ে রোদে শুকোতে হবে। গ) রঙ পাত্রে ২ শতাংশ রঙ হালকার জন্য, মাঝারির জন্য ৪ শতাংশ, গাঢ়র জন্য ৬ শতাংশ সামান্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে রঙের ওজনের ১০-১৫ শতাংশ হাইড্রো, ৫-৫০ শতাংশ কস্টিক সোডা নিয়ে একত্রে গাঢ় দ্রবণ তৈরি করতে হবে। এবার বস্তুর ওজনের ১ঃ১০ থেকে ১ঃ২০ অনুপাতে জলের মধ্যে রঙ এর গাঢ় দ্রবণ মিশিয়ে সূতো বা কাপড় এক ঘন্টা সাধারণ তাপমাত্রায় রাখতে হবে। ঘ) রঙ করা বস্তুটি রঙপাত্র থেকে তুলে ১০ মিনিট বাতাসে মেলে রাখতে হবে। এরপর ঠান্ডা জলে ধুয়ে ০.৫ শতাংশ সাবান জলে ধুতে হবে। আবার ঠান্ডা জলে ধুয়ে রোদে শুকনো করতে হবে।

রঙ শিল্পে জলের গুরুত্ব ঃ রঙ শিল্পে বিশুদ্ধ মৃদু জলের গুরুত্ব অপরিসীম। রঙশিল্প স্থাপনের জন্য প্রথমেই বিশুদ্ধ জলের সুলভতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। তারপরেই দেখতে হবে প্রাপ্ত জল মৃদু না খর।

প্রাপ্ত জলের কিছু পরিমাণ নিয়ে সামান্য সাবান মিশিয়ে ভাল করে নাড়ালে যদি দেখা যায় পর্যাপ্ত ফেনা সৃষ্টি করে এবং তা স্থায়ী হয় তবে বুঝতে হবে এই জল মৃদু জল অর্থাৎ কোনও খরতা নেই। আবার যদি ভাল ফেনা না হয় বা ফেনা হলেও তা স্থায়ী না হয় তা হলে বুঝতে হবে জল খরতা বর্তমান।

যদি প্রাপ্ত জল খর হয় তবে দেখতে হবে খরতা স্থায়ী না অস্থায়ী। সাময়িক খর জলের মধ্যে সোডিয়াম এবং ক্যালসিয়াম বাই কার্বনেট থাকে, যা জল ফোটালে তলায় থিতিয়ে পড়ে। এই তলানি অংশ আলাদা করে নিলে মৃদু জল পাওয়া যায়। আবার স্থায়ী খর জলের মধ্যে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম এর ক্লোরাইড এবং সালফেট যৌগ থাকে যা মেটাক্স বা ক্যালগুন বা EDTA প্রভৃতি যৌগ দিয়ে বিক্রিয়া করে মৃদু জলে পরিণত করা যায়।

ভেষজ রঙ ব্যবহারে কিছু সমস্যা আছে ও তার সমাধানও আছে — ১। খরচ জল ব্যবহারে রঙের অসমতা। খরজলের সঙ্গে মেটাক্স বা ক্যালগুন বা EDTA যে কোনও একটি মিশিয়ে খর জলকে মৃদু জলে রূপান্তরিত করা সম্ভব। ২। রঙ পাত্র নির্বাচনে সাবধানতা প্রয়োজন। নতুবা রঙ এর প্রভাব পরিবর্তিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে মাটির এবং তামার পাত্র ব্যবহার করাই ভাল। এমন কোনও পাত্র ব্যবহার করব না যাতে রঙের বিক্রিয়া ঘটে। ৩। এই রঙ-এর স্থায়িত্ব রাসায়নিক রঙ-এর তুলনায় কম। রঙ করার পর ট্যালিন বা তুঁতে দিয়ে রঙ এর স্থায়িত্ব বাড়ানো সম্ভব। ৪। রঙ পদ্ধতি কষ্টকর হলেও রঙ করার সময় কোনওরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। ৫। প্রচুর পরিমানে পরিশ্রুত জল দরকার হলেও সেই চাহিদা মেটানো সম্ভব।

ভেষজ রঙের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং এর গুণাগুণ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পরি যে এই রঙ ব্যবহার সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যথেষ্ট প্রচার প্রয়োজন। এই ভূমিকায় ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার বস্ত্রশিল্পে ভেষজ রঙ ব্যবহার বাড়াতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন। আশাকরি আগামী দিনে এই রঙ ব্যবহার সুদূর প্রসারী হয়ে উঠবে এবং এই শিল্পে প্রত্যেক মানুষের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি বিধান ঘটবে। আগামী দিনে ভেষজ রঙ বস্ত্রশিল্পে অনিবার্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। — *রঘুনাথ কর্মকার, শান্তিপুর, ৯২৩২৮২৮৩৩৩*

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বিজ্ঞান দরবার

৫ জুন, কাঁচরাপাড়া ঃ কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবারের উদ্যোগে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে কাঁচরাপাড়া স্টেশনে এক প্রচারাভিযানের আয়োজন করা হয়। 'চাই দূষণমুক্ত পৃথিবী'— এই আহ্বানে এক প্রচারপত্র যৌথভাবে রাজ্যজুড়ে প্রকাশ করা হয়। প্রচারপত্রে জলদূষণ সমস্যা ও সমাধান, আর্সেনিক ও ফ্লুরাইড দূষণ সমস্যা ও সমাধান, জলাভূমি ও বিশ্ব উষ্ণায়ণ ও জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়ে বিস্তারিত তথ্যসহ আলোচনা করা হয়।

প্রচারাভিযানে আর্সেনিক দূষণ নিয়ে জয়দেব দে ও সুরজিৎ দাস বিভিন্ন ছবি সহ বক্তব্য রাখেন। বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার পক্ষে কিঞ্জল বিশ্বাস ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য উল্লেখ করে বলেন প্রতিটি শিল্পে দূষণ প্রতিরোধক ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হবে।

বিজ্ঞান দরবারের সম্পাদক বিজয় সরকার বলেন, সারা পৃথিবী জুড়ে পরমাণু চুল্লির বদলে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিগুলির (সূর্য, হাওয়াকল, জলবিদ্যুৎ) ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। পাশাপাশি ক্লোরো-ফ্লুরো কার্বন যেসব শিল্পে ব্যবহৃত হয়, সেগুলির ব্যবহার পুরোপুরি কমিয়ে ফেলতে হবে। প্রচারাভিযানে বিভিন্ন বিজ্ঞানপত্রিকা প্রদর্শিত হয়।

আমাদের মন ভালো নেই, তাই ভালো লাগছে না

হেমন্ত মাহাতো পরিবেশ কর্মী। দূষণ প্রতিরোধ মঞ্চের অগ্রণী কর্মী, মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং পঞ্চায়েত সদস্য। লোধাশুলি গ্রাম থেকে গত ২১/৪/২০১০ ভোরবেলা তাঁকে পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। তাঁর দোষ তিনি ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে গাছ মাফিয়া ও স্পঞ্জ আয়রণ কারখানার দূষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। এর আগে এই দূষণ প্রতিরোধ মঞ্চের অগ্রণী কর্মী উপাংশু মাহাতোকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। 'পরিবেশ উৎসব', 'পরিবেশ মেলা' ঘটা করে পালিত হয়ে চলেছে কিন্তু বড় বড় জলাশয় ভরাট হয়ে চলেছে। উন্নয়নের নামে গাছ কেটে ফাঁকা করে ফেলছে কতিপয় দুষ্কৃতি। তাদের গ্রেপ্তার না করে যারা প্রতিবাদ করছেন তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। আমরা সমস্ত পরিবেশ কর্মী, বিজ্ঞানকর্মী ও মানবতাবাদী কর্মী তীব্র বিরোধিতা করছি।

অবিলম্বে উপাংশু মাহাতো এবং হেমন্ত মাহাতোকে মুক্তি দিতে হবে। মুক্তি দিতে হবে পরিবেশের স্বার্থে। আর প্রকৃত পরিবেশকর্মী, বিজ্ঞানকর্মী ও মানবতাবাদী কর্মীদের আরো ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

বিনীত — চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, বিজ্ঞান দরবার-কাঁচরাপাড়া, নাগরিক মঞ্চ-কলকাতা, অন্তর্দীপন ট্রাষ্ট,, বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকা, হেতুবাদী পত্রিকা, শান্তিপুর বিজ্ঞান ক্লাব, শ্রমজীবী হাসপাতাল (বেলুড়), ভারতের মানবতাবাদী সমিতি (চন্দননগর), বলাগড় গণবিজ্ঞান কেন্দ্র, ডিরোজিও (নবদ্বীপ, বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম, কোচবিহার।

ভোপাল গ্যাস কান্ডের পুনর্বিচার চাই

দীর্ঘ ২৫ বছর পর পৃথিবীর বৃহত্তম শিল্প বিপর্যয় মামলার রায়ে মাত্র ৮ জনের ২ বছরের কারাদণ্ড হল, নিম্ন আদালতে মাত্র ২৫ হাজার টাকার বন্ডে সঙ্গে সঙ্গেই জামিনও মিলল। হ্যাঁ, ১৯৮৪ সালের ২ ডিসেম্বর রাতে ভোপালের ইউনিয়ন কার্বাইড থেকে মিথাইল আইসো সায়ানেট (মিক) গ্যাস লিক করে যে হত্যাকাণ্ড ঘটে তাতে এখন্য পর্যন্ত মৃত ২৫ হাজারেরও বেশি, ৫ লাখেরও বেশি মানুষ বিভিন্ন রোগে ভুগছে।

বিচারক রায় ঘোষণার সময় ইউনিয়ন কার্বাইডের তৎকালীন চেয়ারম্যান 'ঘাতক' ওয়ারেন অ্যান্ডারসন সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করা হয়নি, তাকে ফেরার হিসাবে দেখানো হয়েছে। ১৯৮৪ সালে ৪ ডিসেম্বর অ্যান্ডারসন গ্রেপ্তার হবার সঙ্গে সঙ্গেই জামিন পেয়ে দিল্লীর নির্দেশে আমেরিকা চলে যান, তারপর থেকে অ্যান্ডারসন বেপাত্তা।

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ২০০৩ সালের মে মাসে মার্কিন প্রশাসনের কাছে অ্যান্ডারসনকে ভারতের হাতে প্রত্যার্পণ করার অনুরোধ জানানো হয়। ২০০৫ সালে জুন মাসে মার্কিন প্রশাসন ভারতের অনুরোধকে খারিজ করে দেয়।

ভোপাল গ্যাস কান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে ১০ দফা দাবী সনদ সহ গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করার কাজ চলছে। বিজ্ঞানকর্মীরা ভোপাল গ্যাস কান্ডের পুনর্বিচার, মৃত পরিবার ও আক্রান্তদের যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ, নয়াচর সহ সমস্ত কেমিক্যাল হাব বাতিল, শিল্পে দূষণ প্রতিরোধক ব্যবস্থার দাবী ও পরমাণু দায়বদ্ধতা বিল বাতিলের দাবী জানিয়েছেন।

— সম্পাদক, বিজ্ঞান অন্বেষক

চিঠিপত্র

মহাশয়,

'বিজ্ঞান অন্বেষক' মার্চ-এপ্রিল সংখ্যা ডাকে পেলাম। অনেকদিন বাদে তোমাদের পত্রিকাটি পেয়ে বেশ ভালো লাগলো। 'মুড়িতে ইউরিয়া' সম্পর্কিত লেখাটি সাধারণের জন্যে খুব দরকারী। এই সংখ্যার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ লেখাটি 'ডারউইনের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং বিশ্ব জনমানসে তার প্রভাব'। এই লেখাটির পাশাপাশি আমার হাতে আরো একটা পরিপূরক লেখা এসেছে 'ডারউইন ২০০' (লেখক শুভেন্দু বর্ধন, 'পর্বান্তর' জানুয়ারী ২০১০ তে প্রকাশিত), সেটাও পড়লাম। তোমাদের পরবর্তী সংখ্যাটির অপেক্ষায় থাকলাম, যাতে 'ডারউইনের সৃষ্টিতত্ত্ব ...' এর পরবর্তী পর্যায়ের অংশটা প্রকাশিত হবে। আসলে বিষয়টা আজও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

তোমাদের সংস্থার ও বিজ্ঞান দরবারের বন্ধুদের জন্যে রইলো আমার শুভেচ্ছা।

ধন্যবাদ সহ —
সমরেন্দ্র বিশ্বাস
০৯৯০৭১৮০৯৭৬

মহাশয়,

আপনার পাঠানো 'বিজ্ঞান অন্বেষক' পত্রিকার মে-জুন সংখ্যাটি হাতে পেয়ে খুব ভাল লাগল। প্রতিটি রচনাই তথ্যবহুল। 'ভারতীয় উপমহাদেশের পাখি শীর্ষক রচনাটি বিশেষভাবে ভাল লেগেছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী এটি। অন্যান্য রচনাগুলিও উৎকর্ষতার দাবী রাখে।

আমি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান', 'বিজ্ঞান মেলা' ইত্যাদি পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞান প্রবন্ধ লিখে থাকি। আপনাদের পত্রিকায় লিখতে হলে তার নিয়মকানুন কি কি আছে, যদি জানান তাহলে বিশেষ বাধিত থাকব। আপনার পত্রিকাটি নিয়মিত পেতে গেলেই বা কি করতে হবে? উত্তরের আশায় রইলাম।

ধন্যবাদ সহ —
ডঃ শতাব্দী দাশ
এএ-২৯, প্রফুল্লকানন (পশ্চিম), কলকাতা-১০১

যোগাযোগ – বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড, পো ঃ কাঁচরাপাড়া- ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৮৪৬০৭৭৭, ২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩০০০৯২ ।

সম্পাদক মন্ডলী – অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা থেকে মুদ্রিত ।

সম্পাদক— শিবপ্রসাদ সরদার। (ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০) E.mail- ganabijnan@yahoo.co.in